দ্য উইম্যান ইন কেবিন টেন

মূল : রুথ ওয়্যার

অনুবাদ : কাজী রাহ্‌নুমা নূর

শব্দশৈলী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দ্য উইম্যান ইন কেবিন টেন
মূল : রুথ ওয়্যার
অনুবাদ : কাজী রাহ্‌নুমা নূর

প্রচ্ছদ : জুলিয়ান

© লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনমুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-984-98579-4-5

শব্দশৈলী-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

The Woman In Cabin Ten
By Ruth Ware
Translated By
Kazi Rahnuma Noor

Published by Iftekhar Amin
Shobdoshoily, 38/4, Banglabazar Dhaka-1100

উৎসর্গ

যে কোন সৃষ্টির পেছনে চারপাশের মানুষের অনুপ্রেরণা জরুরি। আমার অনুবাদক হয়ে ওঠার পেছনে যাদের উৎসাহ আর দোয়া ছিল ও আছে তাঁরা হলেন আমার বাবা অধ্যাপক কাজী নূরুল হক।
যাদু কাকা ডা. কাজী বেলায়েত আলী
নানু সুরমা চৌধুরী
আন্টি নুরুন নাহার রহমান।

টেন-১
টেন-২
টেন-৩
টেন-৪
টেন-৫
টেন-৬
টেন-৭
টেন-৮
টেন-৯
টেন-১০
টেন-১১
টেন-১২
টেন-১৩
টেন-১৪
টেন-১৫

অধ্যায় এক

শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর

এক

বেড়ালের থাবার হালকা আঁচড়ে ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। রুমে ডিমলাইটটা না জ্বালিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম তাই পুরো রুমটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের চাদর পরে আছে। রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরলে যা হয়। বেড়ালটাকে হাতের হালকা ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বালিশে আবার মুখ গুঁজে দিতেই তার মুখ দিয়ে আবারো আমার কান ঘষতে লাগলো। কি যন্ত্রণা এই রাত দুপুরে বেড়ালটার কি হলো? এবার একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে ডিলাইলাকে বিছানা থেকে ছুড়ে ফেলে মাথাটা লেপে মুড়িয়ে আবারো শুয়ে পড়লাম। লেপের নিচ থেকেই শুনতে পেলাম ডিলাইলা দরজার কপাটে অদ্ভুত এক শব্দ করতে করতে আঁচড় কাটছে। ঘুমটা একদম হাওয়া হয়ে গেল, ধড়ফড় করে উঠে বসতেই ডিলাইলা আমার কোলে এসে বসল। ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করে বাতাসে কান পাতলাম। বাইরে কি কোনো শব্দ হলো?

এ ঘরের দরজাটা বন্ধ।

কাল রাতে কি আমি রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম?

কিন্তু আমার ঘরের দরজাটা তো বাইরের দিক থেকে খোলে তাহলে ডিলাইলা কীভাবে বন্ধ দরজা খুলে আমার রুমে ঢুকলো?

ভয়ে আমার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডিলাইলার গরম তুলতুলে শরীরটা চেপে বুকে ধরে আছি। আস্তে আস্তে নিজকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। হতে পারে আমি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বা এমনও হতে পারে– ডিলাইলা তার নিজের শোবার জায়গায় না শুয়ে আমার খাটের নিচে ছিল। মাথাটা প্রচণ্ড ধরে আছে। হ্যাং ওভার। কাল রাতে কিভাবে ট্রেনে চড়ে ফিরে এসেছি কিংবা ঘরে ঢুকেছি কিছুই মনে পড়ছে না। নাহ সপ্তাহের

মাঝখানে ড্রিংক করা বন্ধ করতে হবে, এখন আমার বয়েস আর বিশের কোঠায় নেই, নিজেকে খুব করে বকে দিলাম।

আমি শান্ত হয়ে এলেও ডিলাইলা আবারো তার হাতের তালু দিয়ে আমার হাতে আর থুঁতনিতে হালকা আঁচড় দিতে শুরু করল। কিছু একটা হয়েছে ঘরে না হয় ও এত অস্থির হয়ে উঠত না। হালকা পায়ে উঠে ড্রেসিং গাউনটা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে ডিলাইলাকে কোলে নিয়ে আমার রুমের দরজাটা খুলতেই দেখি একটা লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রান্নাঘরের বাতিটা জ্বালানো; হালকা আলো এসে পড়েছে, সে আলোয় প্রথমেই চোখ পড়ল ওর হাতের দিকে– হাতে কোনো চামড়া দেখতে পেলাম না।

ও দেখতে কেমন ছিল? সকাল থেকে সম্ভবত পঁচিশবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

ওর হাতের চামড়ার রঙ তুমি দেখতে পাওনি?

না না না, আমি দেখিনি। আর কতবার বলব আমি জানি না ওর গায়ের রঙ কেমন ছিল।

ওর মুখ মুখোশে ঢাকা ছিল, জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে চোখ পড়তেই আমি ভয়ে মূর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। ওর হাতে পরে থাকা চামড়ার গ্লাভস দুটো ছিল ভয়ংকর। ওই হাত যেন বারবারা বলছিল– আমি শুধু তোমার অর্থ চাই না আরো অনেক কিছু চাই।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার শুধু মনে হচ্ছিলো, কে বলেছিল রাতে মদ খেয়ে মাতাল হতে, নিশ্চয়ই ঘরের দরজা খোলা রেখে শুয়ে পড়েছিলাম। তা যদি না হতো তবে এ লোকটা তো আমার ঘরে ঢুকতে পারত না।

আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণপণে বলছিলাম, আমাকে রক্ষা করো প্রভু।

জানি না কতক্ষণ চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডিলাইলা ভয় পেয়ে কোল থেকে লাফিয়ে নেমে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল। আমার মাথায় শুধু ঘুরছিল মোবাইলটা হাতে থাকলে এখুনি ৯৯৯ কল দেওয়া যেত, কিন্তু মোবাইলটা কোথায় রেখেছি সেটা মনে পড়ছিল না। মাথায় এক সাথে হাজার হাজার চিন্তা আর ভয় একটা আরেকটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। ঠিক তখন লোকটার হাত একটু নড়ে উঠতেই দেখলাম তার হাতে ধরে থাকা আমার বেগুনি রঙের হাত ব্যাগ। আর সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল মোবাইলাটা ওই হাত ব্যাগে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো মুখোশের আড়ালে সে হাসছে।

আমার শরীর আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছিল, হয় সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে যেতে হবে বা লোকটা আক্রমণ করার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঠিক সে মুহূর্তে লোকটার পুরো শরীর নড়ে উঠতেই আমার মুখ দিয়ে না শব্দটা বের হলো। যদিও কথাটা চিৎকার করে বলতে চাইছিলাম কিন্তু শব্দটা গলা দিয়ে গোঙানির মতো করে বের হলো। খুব জোরে আমার মুখের ওপর দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হলো। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকায় দরজাটা আমার মুখে আঘাত করে।

বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখের ডান পাশটা ব্যথায় টন টন করছিল আর আমার হাতের আঙুলগুলো ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা। একটু পরেই হালকা গরম স্পর্শ পেলাম মুখের চামড়ায়। হাত দিতেই বুঝলাম আমার ডান চোয়াল কেটে রক্ত পড়ছে।

দৌড়ে লেপের নিচে ঢুকে বালিশে মাথা ঢুকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শরীরটা যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, কোনো শক্তি পাচ্ছিলাম না। মাথার ভেতরে কেউ যেন চেঁচিয়ে বলছিল, লোকটা তোমার ঘরেই আছে, আবার যদি দরজা খুলে তোমাকে আক্রমণ করে বসে কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে?

ঠিক তখন পাশের রুমে শব্দ করে কিছু একটা মাটিতে পড়ল। এরপর মনে হলো অনন্ত যুগ কেটে গেছে। সামনের দরজা খোলার শব্দ পেলাম, লোকটা বোধহয় বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় কান পাতলাম। সদর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হওয়ার শব্দটা পেলাম। কিন্তু এক চুলও নড়তে পারলাম না। স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার দরজার ওপাশে ডিলাইলার মিউ মিউ আর আঁচড়ের শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলাম যেন। ভয়ে ভয়ে দরজার হাতলে হাত রাখলাম আর আস্তে আস্তে বললাম, ডিলাইলা আমি আসছি।

দুই

হাতলটা ঘোরাতেই খুব সহজে সেটা ঘুরলো, কিন্তু দরজাটা খুললো না। একটু পর বুঝলাম অন্য পাশের হাতলটা লোকটা খুলে নিয়েছে, তার মানে আমি এই রুমে বন্দি।

আপ্রাণ চেষ্টা করলাম রুমের দরজাটা খুলতে। আমার কোনো ল্যান্ডফোন নেই। ওই মোবাইলই একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম ছিল, তাই বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। যা করার নিজেকেই করতে হবে।

জুডাহকে খুব মনে পড়ছিল, ও যদি এখন আমার সাথে থাকত তবে এসবের কিছুই আমাকে একা মোকাবিলা করতে হতো না।

সারা রুমে খুঁজে একটা কাঁচি আর একটা কাঁটাচামচ মিলল। ওই দুটি দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর দরজাটা খুললাম। ভয়ের কারণে বা নার্ভাস থাকায় দুই হাতের বেশ কিছু জায়গা কেটে গেছে। দরজাটা খুলতেই ডিলাইলা লাফিয়ে আবারো আমার কোলে উঠে বসল।

ধীরে ধীরে আলো-আঁধারিতে চারপাশটা দেখলাম। মাথার ভেতরে দপদপ করে কেউ হাতুড়ি দিয়ে যেন বাড়ি দিচ্ছে। এই ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি রুম। একটা শোবার ঘর, একটা সিটিং আর একটা রান্নাঘর। আমার দরজার সামনে থেকেই সবটা দেখতে পাওয়া যায়। তবু ঘরে কেউ নেই তা নিশ্চিত হতে প্রতিটি রুম তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। সোফার পেছনে, ছোট্ট স্টোররুম– সবকিছু দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, না কেউ নেই ঘরে।

পুলিশে খবর দেওয়াটা জরুরি তাই এক জোড়া জুতো পায়ে গলিয়ে আমার প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। এখন অনেক রাত, তাই স্বাভাবিকভাবেই সবাই গভীর ঘুমে। বারবার পেছনে তাকাচ্ছি– এই বুঝি কেউ পেছন থেকে মুখ চেপে ধরবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, একটু পর ভেতর থেকে শব্দ পেলাম। মিসেস জনসন দরজার ওপাশ থেকে নিশ্চিত হতে চাইলেন বাইরে সত্যি আমিই এসেছি কিনা। তারপর দরজা খুললেন। তাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন আর বিরক্ত মনে হলো। উনি চোখটা হাত দিয়ে চটকে আমার দিকে ভালো মতো তাকিয়েই কেঁপে উঠলেন।

সে কি তোমার মুখে দেখছি রক্ত? কি হয়েছে? ভেতরে এসো, কথাগুলো হড়বড় করে বলে গেলেন মিসেস জনসন। তার বয়স হয়েছে। ফ্ল্যাটটা ও খুব পুরনো আমলের আসবাবপত্রে ঠাসা। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই হিটিংয়ের গরমটা আমার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ক্লান্ত শরীরটা যেন বুবুক্ষের মতন শুষে নিলো। উনি আমাকে সোফায় বসতে বলে জানতে চাইলেন চা বা কফি চাই কিনা?

এখন প্রায় রাত ৪টা বাজে। এমনিতেই এত রাতে মাঝবয়সি একজন মানুষকে ঘুম থেকে তুলে বিরক্ত করছি– তাই তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে না বললাম। কিন্তু মিসেস জনসন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এমন অবস্থায় গরম মিষ্টি চায়ের কোনো বিকল্প নেই। তুমি একটু বসো আমি আসছি।

এই বলে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন আর একটু পর এক কাপ চা আমার হাতে তুলে দিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে ও চা হাতে নিলাম। এখনো হাত দুটো হালকা কাঁপছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই আমার নোনা মুখটা মিষ্টিতে ভরে গেল। সারাশরীরে খানিকটা প্রশান্তি নেমে এলো যেন।

মিসেস জনসন চা খেলেন না। তার কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

তোমাকে কিছু ...

বুঝতে পারলাম উনি কি বোঝাতে চাইছেন।

না না লোকটা আমাকে কিছু করেনি। আস্তে আস্তে তাকে সবকিছু খুলে বললাম। জানালাম কীভাবে দরজাটা আমার মুখের ওপরে বন্ধ হওয়ায় গালটা কেটে গেছে আর নেইল ফাইল আর সিজার দিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে হাতটা কেটেছি। বলতে বলতে আবারো জুডাহর কথা মনে পড়ল। ও সবসময় বলে আমি কোনো কিছু সোজা নিয়মে সঠিক টুল ব্যবহার করে করি না। যেমন আমি স্ক্রু খুলতে কেক কাটার ছুরি ব্যবহার করি। জুডাহ একটা কাজে ইউক্রেনে গেছে, ওর কথা ভাবতেই চোখে পানি এসে গেল। না আমি এখানে কোন সিনক্রিয়েট করতে চাই না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিসেস জনসনকে চায়ের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, আমি ঘটনাটা পুলিশকে জানাতে চাই। তার ফোন থেকে ফোন করা যাবে কিনা?

মিসেস জনসন বললেন, চা শেষ করে ফোন করো। সোফার পাশের টেবিলে কাপড় দিয়ে ঢাকা ফোনটা দেখালেন, সম্ভবত এটি লন্ডনে একমাত্র ডায়ালআপ ফোন।

চা শেষ করে ফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে ৯ ডায়াল করে থেমে গেলাম। ঘটনা যা হবার তা তো হয়েই গেছে, ইমার্জেন্সি নাম্বারে ফোন দিয়ে আর কি হবে? ১০১ ডায়াল করলাম।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে ভাবলাম ইন্স্যুরেন্সের কথা, যেটা আমি গত কয়েক বছর যাবত করব করছি বলে ফেলে রেখেছিলাম। বহুবার সিকিউরিটি সিস্টেম বসাবো ভেবেও পিছে হটেছি। আজ তার মাসুল গুনছি। তারপর মনে পড়ল দরজায় নতুন লক দিতে হবে।

কয়েক ঘণ্টা পর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লক স্মিথের কথা শুনতে শুনতেও আমার মাথায় ওই আগের কথাগুলোই ঘুরছিল। কেন ইন্স্যুরেন্স করালাম না? লক স্মিথ আমার সদর দরজার প্যানেল দেখিয়ে বললো, কিছু মনে করো না ওপরের প্যানেলটা দেখেছো? খুবই দুর্বল। এই দরজায় যদি আমি মাঝারি সাইজেরও একটা লাথি দিই এটা ভেঙে পড়বে, দেখতে চাও।

না চাই না, গম্ভীর হয়ে জানালাম। লোকটা বকবক করেই চলেছে, দরজা যদি শক্ত না হয় তবে যত ভালো লকই লাগাও কোনো কাজ হবে না বুঝলে?

দরজার জন্য চিন্তা করো না আমি ওটা পরে ঠিক করাব। তুমি তো দরজার কাজ করো না তাই না?

না। উপরের ঠোঁটটা বাঁকিয়ে উত্তর দিল লোকটা। পুলিশের হিসেব মতে ২৫% ক্ষেত্রে চোর একই ঘরে ২য় বার চুরি করতে আসে। তুমি নিশ্চয়ই তা চাও না?

না। খুব ক্ষীণ শোনালো আমার কণ্ঠ। এসব শুনতে আর ভালো লাগছে না।

তুমি আপাতত লকের একটা ব্যবস্থা করো।

লন্ডনে নানা রকমের লক পাওয়া যায়, বিভিন্ন দামের। তোমার দরকার শক্ত ডাবল লক। বুঝেছ তো আমি কি বলছি। শপে পাবে তবে আমার গাড়িতেও আছে; তুমি চাইলে সেটাই লাগিয়ে দিতে পারি। তবে সমস্যা কি জানো তো– এই দরজা এত পলকা একটা শক্ত লাথি দিলে দরজার ফ্রেমসহ খুলে আসবে হে হে।

লোকটার এ রকমের রসিকতায় মেজাজ চড়ে গেল। এই লোক টাকা খাওয়ার ধান্দায় আছে, যত্তোসব।

আমাকে চুপ থাকতে দেখেই মনে হয় লোকটা বুঝলো আমি তার ব্যবহারে ক্ষেপেছি। চট করে বললো, আমার গাড়িতে সম্ভবত একটা প্লাইউড আছে। চিন্তা করো না তোমাকে এর জন্য কোনো দাম দিতে হবে না। আমি ফ্রিতেই দিচ্ছি। এই চোর আর এই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না।

জানি না কেন লোকটার কথায় কোনো ভরসা পেলাম না।

আমার বেড়াল ডিলাইলা ঘরের প্রতিটি কোণে নাক ঘষছে, যেন জানান দিচ্ছে– এই ঘর তার আর কারো নয়। চোরটা ঘরে ঢোকার পর থেকে এই ঘরটাকে খুব অপবিত্র লাগছে, মনে হচ্ছে আমার এই শান্তির ছোট্ট পৃথিবীটা কেউ তছনছ করে দিয়েছে। ফোনের ওপার থেকে পুলিশের প্রশ্নগুলো এখনো কানে বাজছে।

–দেখতে কেমন ছিল?

–আমি জানি না, চেহারা তো দেখিনি।

–কি কি চুরি গেছে?

–শুধুই আমার হাতব্যাগ।

–কি ছিল হাত ব্যাগে?

আমার জীবন। ফোন, ব্যাংক কার্ড, ওষুধ, মাস্কারা, লিপিস্টিক, ড্রাইভিং লাইসেন্স।

তারপর শুরু হলো জেরা। কোন ধরনের ফোন? ব্যাগে কি কি ধরনের ওষুধ ছিল নাম দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জানি পুলিশ তার কাজ করছিল।

এই প্রশ্নের জন্যে আমার বিরক্ত হয়ে ওঠা অযৌক্তিক ছিল কিন্তু কেন যেন সব কিছুতেই রাগ চেপে বসছে মাথায়। রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা হাতে নিয়ে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াবার মুহূর্তেই ধাম ধাম ধাম।

কেউ খুব জোরে দরজায় শব্দ করল।

আমার সারা শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। পায়ের পাতাগুলো শক্ত হয়ে যেন ফ্লোরে গেঁথে গেছে। কিছুতেই পা তুলে দরজার দিকে এগোতে পারছিলাম না।

আরেকবার দরজায় শব্দ হতেই যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখলাম আমার হাতে ধরে থাকা কাপটা মেঝেতে কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আমার পা দুটো গরম চা পড়ে ভিজে আছে। জ্বলুনি টের পাচ্ছি। কোনোমতে চেঁচিয়ে বললাম, দাঁড়াও আমি আসছি।

দরজা খুলে ধরতেই দেখি একজন পুলিশ অফিসার ফোনে জেরা শেষ– এখন সরেজমিনে দেখতে এসেছে। সে হেসে বললো, খুবই দুঃখিত ম্যাডাম। দরজায় কলিংবেল না থাকায় তুমি আমার নক শুনতে পাচ্ছিলে কিনা বুঝিনি বলেই এতবার নক করেছি। এই বলেই সে সামনের মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা কাপ দেখে বলে উঠলো, ওমা তোমার ঘরে দেখছি আজ সব কিছু ভাঙছে, হা হা হা।

এমন ভয়ংকর সময়ে এরা হাসে কি করে? যেন কিছুই ঘটেনি। আশ্চর্য!

পুলিশ সব কিছু লিখে নিতে নিতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। পুলিশ যেতেই আমি ঘরে ঢুকে আমার ল্যাপটপটা নিয়ে সোফায় বসলাম। ভাগ্যিস ল্যাপটপটা বেডরুমে থাকায় চোরটা খুঁজে পায়নি। ল্যাপটপটায় সব তথ্য সেভ করে রাখা। এবার সত্যিই একটা হার্ডড্রাইভ কিনে সব ঢুকিয়ে রাখতে হবে। এই ল্যাপটপ আজ হারালে সর্বনাশ হতো। ই-মেইলটা খুলতেই প্রথম ই-মেইলে লেখা–

তোমার কি কাজে আশার কোনো প্ল্যান আছে আজ? এখন কটা বাজে?

আরে এসব ঝামেলায় ভেলোসিটিকে দুর্ঘটনার কথা জানাতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ই-মেইল লিখতে গিয়েও হঠাৎ মনে পড়ল চা পাতার পটে আমি ২০ পাউন্ড লুকিয়ে রাখি যদি কখনো প্রয়োজন হয় এই ভেবে। পট থেকে টাকাটা নিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে নানাভাবে বুঝিয়ে একটা ১৫ পাউন্ডের পে এজ ইউ গো মোবাইল সিম কিনে একটা ক্যাফেতে ঢুকলাম। নাম্বার খুঁজে বের করে সহকারী ফিচার এডিটরকে ফোন করলাম। জেন, সে আমার উল্টো দিকের টেবিলে বসে।

আমি তাকে পুরো বিষয়টি খুব মজা করে বললাম যেন সে কিছুতেই আমার ভেতরকার ভয়টা দেখতে না পায়। হেসে হেসে কথাগুলো বললেও আমার ভেতরটায় একটা গুমোট ভয় গুটিসুটি মেরে বসে আছে। বুঝলে তার হাতটা কালো হাত মোজায় ঢাকা ছিল।

কিন্তু জেনকে খুব উদ্বিগ্ন শোনালো, তুমি সত্যি ঠিক আছো তো। শুনে আমার নিজেরই তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভাবতেই পারছি না তুমি কীভাবে হেসে কথাগুলো বলছ; অনেক সাহস তোমার।

না না আমি ঠিক আছি তবে আজ আর অফিসে আসতে পারছি না কারণ পুরো ঘরটা গোছাতে হবে। যদিও চোরটা খুব বেশি অগোছালো ছিল না হাহা হা।

না না শোন তুমি সময় নাও। আর হ্যাঁ তোমার কি মনে হয়? তুমি নর্দার্ন লাইটস প্রজেক্টটায় যেতে পারবে? তুমি যদি না পারো কোনো সমস্যা নেই আমি আর কাউকে পাঠিয়ে দেব। কিছুক্ষণের জন্য আমি বুঝতে পারছিলাম না কিসের কথা বলছেও। একটু পরে মনে পড়ল, অরোরা বোরেলিস একটা নতুন সুপার লাক্সারি জাহাজ, যেটি নরওয়ের হ্রদগুলোর ভেতর দিয়ে একটা ট্রিপে যেতে লেখক, সাংবাদিক এবং সমাজের নানা সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সামান্য কজন সাংবাদিক যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমি অনেক দিন ধরে বসে আছি এমন একটা সুযোগের জন্য। সাধারণত ভ্রমণবিষয়ক ম্যাগাজিনে কাজ করলেও আমার কাজ ছিল নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন ভ্রমণের কাহিনি কপি আর পেস্ট করে সেগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং এই একঘেয়ে কাজ করতে আর ভালো লাগছিল না।

আমাদের অফিসে বেশির ভাগ মজার কাজগুলো করে রোয়ান। কিন্তু এবার আমার ভাগ্য খুলেছ কারণ রোয়ান হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়ায় যেতে পারছে না। আমি যেচে এই দায়িত্ব নিয়েছি। প্রথম দিকে আমার ম্যানেজার যদিও খুব একটা সাহস পাচ্ছিল না কিন্তু আমি তাকে নানাভাবে বুঝিয়েছি যে, এ কাজটি আমাকে দিয়ে সম্ভব। আর সম্ভবত ওর হাতে এ মুহূর্তে আর কেউ নেই।

আমি যদি এই কাজটি ভালোভাবে করতে পারি তবে রোয়ান যখন এক বছর মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকবে তখন আমি ওর পোস্টটি কাভার করতে পারব এবং যদি দক্ষতা দেখাতে পারি তবে ওরা হয়তো আমাকেও একটা প্রমোশন দিয়ে এ ধরনের অ্যাসাইনমেন্টগুলোতে পাঠাবে। এই বিশাল সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।